গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালপর্যায়ের নির্বাচিত চারজন কবির কাব্যযাত্রায় সমর্পণ ও বিদ্রোহ

প্রথমেই এই গবেষণাকর্মের শিরোনামটির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কারণ, এই গ্রহণীয় গবেষণাকর্মের নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে গবেষণার মূল বিষয়, উদ্দেশ্য ও আভিপ্রায়িক প্রবণতা। গবেষণাপত্রের কালপর্যায় হিসেবে একসঙ্গে উল্লিখিত রয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী। নির্বাচিত চারজন কবির মধ্যে গবেষক বেছে নিয়েছেন দুই পর্যায়ভেদে চারজন কবিকে। এই চারজন কবি যথাক্রমে— স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়ের কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের কবি কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৯), কবি দেবারতি মিত্র (১৯৪৬-)। স্বাধীনতা পূর্বের কবি কামিনী রায় এবং কবি মানকুমারী বসুর কাব্যরচনার পরিসরকাল প্রায় সমসাময়িক। এই দুজন কবির কবিতাপাঠ করার আগে অবধারিতভাবে এবং প্রসঙ্গক্রমে এসে যেতে পারে তাঁদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবিদের নাম, যাঁরা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়কালের মধ্যেই পড়েন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধারাণী দেবী প্রমুখ কবি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গবেষণাপত্রের শিরোনামকে স্মরণে রেখে মহিলা দ্বারা সৃষ্ট কাব্যে যে সমর্পণ ও বিদ্রোহের স্বর-সন্ধান গবেষকের মূল লক্ষ্য, তার প্রকৃত প্রভাব নির্বাচিত দুই কবিস্বর অর্থাৎ কবি কামিনী রায় এবং কবি মানকুমারী বসুর মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছেন গবেষক। তাই তাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছে। কবি মানকুমারী বসুর কবিতার সংখ্যা গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট, তেমনই বিস্তৃত আলোচনার জন্য সংখ্যায় বেশ উপযুক্ত কবি কামিনী রায়ের কবিতাও। কিন্তু, উভয়ের কবিতায় সমাজের প্রতি সমর্পণ ও বিদ্রোহের স্বর আগে কখনো খোঁজা হয়নি। তাই নির্বাচিত দুজনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়-সমাজ ও কাব্যজগতের সন্ধান চলেছে। অপরদিকে, স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়কালের শুরুর পথে নারীদের দ্বারা সৃষ্ট কাব্যে ঠিক কী ছিল? আধিপত্যবাদের পায়ে সমর্পণ নাকি বিদ্রোহ? এই স্বর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, কবি কবিতা সিংহ এবং কবি

দেবারতি মিত্র মাত্র একদশকের তফাতের দুই কাব্যস্রষ্টা। এঁরা দুজন যেন একে-অপরের আবাহন ও বিসর্জন। অর্থাৎ, একজনের স্বর সরাসরি এবং জোরালো কাব্যবোধময়। অপরজনের কাব্যস্বর মৃদু কিন্তু ব্যক্তি সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত অবস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রভূমি প্রকটভাবে বিদ্যমান। ফলে, এই দুজনের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিশেষ কবিবর্গ— রাজলক্ষ্মী দেবী, নবনীতা দেবসেন, গীতা চট্টোপাধ্যায়, মল্লিকা সেনগুপ্তর বদলে এঁদেরকেই নির্বাচন করা গবেষণাপত্রের গতিবিধি বোঝানোর জন্য যথার্থ বলে মনে হয়েছে গবেষকের।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল থেকে মূলত উনিশ শতকের শুরুকেই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সূচনাকাল হিসেবে ধরা হলেও 'পূর্ববর্তী' শব্দটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে প্রাচীনকাল থেকে অনুশাসিত সমাজের স্বরের ভিতর দাঁড়িয়ে নারীর সমাজ, সমকাল ও কাব্যস্বরকেও তুলে আনার চেষ্টা করা হবে সংক্ষিপ্তভাবে। তবে কাব্যস্বরের এই যথাযথ অবস্থান তুলে ধরতে বেছে নেওয়া হবে উনিশ শতককে। শিরোনাম অনুযায়ী বিষয়পর্ব জুড়ে উদ্দেশ্য থাকবে স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার পরে ইংরেজদের দ্বারা খাতায়কলমে সৃষ্ট অথচ প্রতিটি পুরুষ সমাজের মজ্জায় সংক্রামিত আধিপত্যবাদ মেয়েদের কাব্যিক মজ্জায় ঠিক কেমন প্রভাব ফেলেছিল? লেখকের মতো স্বাধীনসত্ত্বা গ্রহণ করেও কি নারীরা আধিপত্যবাদের পায়ে নিজেদের সমর্পণের স্বরই প্রতিষ্ঠা করে গেছে নাকি বিদ্রোহ করেছে? ঠিক একইভাবে, স্বাধীন ভারতে বাঙালি সমাজ যখন স্বাধীনতার আনন্দে-উৎসবে মগ্ন, তখন নারীরা কতটা স্বাধীন? স্বাধীনতার উদ্‌যাপন কি নারীদের নতুন ভাষা দিচ্ছে? এই সকল খোঁজের ভিতর দিয়ে গবেষকের সর্বশেষ উদ্দেশ্য নির্বাচিত চারজন কবির ভিতর স্বরালাপ সাধন করা। পর্যায়গত দিক থেকে কি একজন অপরজনের জন্য সিঁড়ি তৈরি করে দিচ্ছেন নাকি নিজের আবর্তে হারিয়ে ফেলছেন নিজেকে? মিল-অমিল-যোগসূত্র সন্ধানের মধ্য দিয়েই গবেষণা সমাপ্তির ইচ্ছে রয়েছে গবেষকের।

বাংলা সাহিত্যে এর আগে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উনিশ শতকের কাব্যসমাজ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কাব্যসমাজকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বহু কাজ হয়েছে। গবেষণাপত্রের মূল অংশে যেখানে নির্বাচিত চারজন কবির কবিতা নিয়ে কথা বলা হবে, সেই চারজন

কবিকে এবং তাঁর বা তাঁদের কবিতাকে ঘিরে আগেও বেশ কিছু ভালো কাজ আমরা পেয়েছি। কিন্তু গবেষণাপত্রের বিষয় অনুযায়ী দুই সময়ের ভিন্নধর্মী কবিদের কাব্যযাত্রার সমর্পণ ও বিদ্রোহ ঘিরে এযাবৎ কোনো কাজ এখনো হয়নি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়ের কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায় যে সময়ে কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করছেন সেই সময় পর্যায়ে সমাজে সতীদাহপ্রথা চলছে রমরমিয়ে। বাল্যবিবাহ ব্যবস্থায় অবধারিত দণ্ডিত হচ্ছে সমাজের নব্বই ভাগ নারী লিঙ্গে চিহ্নিত বালিকা। অল্প বয়সে বিধবা এবং তার বৈধব্যের যন্ত্রণা সমাজের সিংহভাগ নারীর ললাট লিখন হিসেবে নির্ধারিত ছিল। এরই পাশাপাশি ভয়ংকর ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথা, যা সমাজের ক্ষত হিসেবে অত্যন্ত চিহ্নিতময় একটি বিষয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীদের ছিল না কোনো অধিকার, ফলে অর্থনৈতিক উপার্জন তো দূরে থাক, ভবিষ্যতের নির্ভরতাও ছিল অন্ধকারে। তাই সর্বত্র প্রচ্ছন্ন ছিল একটা চাপা পড়া দীর্ঘশ্বাস ও কণ্ঠস্বর। মনে রাখতে হবে, এক দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস কাঁধে নিয়ে দণ্ডায়মান নারীদের নিজের মাটি, নিজের ভাষা এবং নিজের চেতনাশ্রিত আভিপ্রায়িক স্বর-অস্তিত্ব প্রমাণের এই তিন গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান থেকেই বহুযোজন দূরে রাখা হয়েছিল। ফলে প্রাচীনকালের অবমাননার পর্যায় ধরেই এই ধরনের পিছনের গতিপথে যখন এসে পৌঁছানো হল উনিশ শতকীয় মহলে, তখন আলোর তীব্রতায় খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল সমাজের দীর্ঘ গভীর ক্ষতগুলি। আসলে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায় জুড়ে যে আধিপত্যবাদনীতি বাঙালি জীবনে জায়গা করে নিয়েছে সেই নীতির জানালা দরজা এতটাই উন্মুক্ত এবং পর্দাহীন যে আধিপত্যবাদের শুভ-অশুভ দুই দিকই সাদা পাতায় কালির আঁচড়ের মতো পরিষ্কার এবং জ্বলজ্বলে। তাই এই সময়পর্বের দুই নারীর, দুই কবির কলমে তাদের নিজেদের সমাজজীবনে চিত্রপট যে পরিমাণ প্রামাণ্যযোগ্য দলিল হয়ে উঠবে, একজন পুরুষ কবির কলমে সেই প্রামাণ্যের খানিক হলেও অভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, সমাজ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাবে প্রভাবিত। এসব কিছুকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে অবমাননা এবং রক্ষণশীল নৃশংসবোধ দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি হল ‘স্ত্রীশিক্ষা রদ’ অর্থাৎ মেয়েদের পড়াশোনা শেখার পথের সেই কঠিন বাধা। অপরদিকে নারীশিক্ষা সংস্কারের শুরু এই উনিশ শতকেই। নারীদের অন্ধকারময় যাপনে আলো ফেলার চেষ্টাও শুরু এই পর্যায়ে।

সেই সমাজব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করে যারা শিক্ষালাভের সুযোগ পেল, একমাত্র তাদের কাব্যেই সম্ভব সমাজ ও সমসাময়িকতাকে খুঁজে বের করা। তাই উনিশ শতকে নারীর কাব্যচর্চায় সমর্পণ ও বিদ্রোহের স্বরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায়কে। দেখা গেছে, লেখকের মতো স্বাধীন সত্তা গ্রহণ করেও নারীরা আধিপত্যবাদের পায়ে নিজেদের সমর্পণের স্বর প্রতিষ্ঠা করে গেছে অধিক। সেই নিয়ে আলোচনাও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায়ের কাব্যের ভিতরে বিদ্রোহীসত্তাকে তলিয়ে দেখা হয়নি সেভাবে। সামাজিক ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী থেকে কীভাবে তাঁরা সেই সমাজকে অস্বীকার করার সুপ্ত বীজ বপন করছে নিজেদের কাব্যের ভিতর দিয়ে সেই হদিশ পেতে গিয়ে এমন প্রচুর কবিতা উঠে এসেছে যার মধ্যে দেখা গেছে সমাজকে তিরস্কার করা, নিজের কামনা বাসনার কথা ব্যক্ত করা, আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা এবং নারী হিসেবে সমাজের বন্ধনে নিজেকে আটকে না রেখে মানুষ হওয়ার যজ্ঞে নিজেদেরকে নিজেরাই ডাক দিচ্ছেন। এভাবে তাঁদের কবিতাকে আগে দেখা হয়নি। যেকোনো একটি গতিপথে বেঁধে দেওয়া অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে পরাধীনতার আগলে বদ্ধ নারীদের কণ্ঠে সমর্পণের সুর এবং সেই নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাকে কবিদের কাব্যের ভিতর দিয়ে খোঁজা হয়েছে। গার্হস্থ্য অবস্থান, স্বামী-সন্তান-সংসার, এই চেনা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে করতে কখন যেন মানকুমারী বসুর মনে হয়েছে এই সংসার আসলে শ্মশান। কবি কামিনী রায় বলছেন নিজের শিল্পপ্রীতি, সৌন্দর্যবোধ সব নষ্ট হয়ে গেছে এই সংসারধর্মে প্রবেশের পর। এমন কাব্যিক উচ্চারণগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর রীতিমতো চমকে উঠতে হয়েছে। অপরদিকে, স্বাধীন ভারতে বাঙালি সমাজ যখন স্বাধীনতার আনন্দে-উৎসবে মগ্ন, অর্থাৎ সমাজের মূল স্রোতের উল্লাস। সেই উৎসবের কতখানি ভাগীদার নারীরা নিজেদের যাপিত বৃত্তে? স্বাধীনতার উদ্‌যাপন কি নারীদের নতুন ভাষা দিচ্ছে? এই সকল খোঁজের ভিতর দিয়ে গবেষক সর্বশেষ অধ্যায়ে নির্বাচিত চারজন কবির ভিতর স্বরালাপ সাধন করেছেন। পর্যায়গত দিক থেকে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে প্রত্যেকের বক্তব্যের স্বর আলাদা হতেই হতো। মন ও মননগত বৈসাদৃশ্য শিক্ষাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু

তারপরেও তারা ইতিহাসের উত্তরাধিকার রচনা করেছে এমনই মনে হয়েছে কাজ করতে গিয়ে। যেন এক মশাল দৌড়। একজন আরেকজনের হাত অবধি পৌঁছে দিচ্ছে আলো। সেই আলো দৌড়চ্ছে আরেক হাতের কাছে যাওয়ার আগে অবধি। গবেষণার শেষ অধ্যায়ে মিল-অমিল-যোগসূত্র সন্ধানের মধ্য দিয়েই গবেষণা সমাপ্তি ঘটানোর ইচ্ছে রয়েছে। নামকরণ অনুসারে সমগ্র গবেষণাপত্র জুড়ে যে যে বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে, তার জন্য সাজানো হবে মূলত চারটি অধ্যায়, এছাড়াও রয়েছে ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের স্বর খুঁজতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাত্য থেকে যায় কবি হিসেবে নারীদের উন্মেষকালের কথা। গীতিকবি হিসেবে আখ্যা দেওয়ার পর নারীদের কবিতা নিয়ে সমালোচকদের আর বিশেষ কিছু বলার থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দুজন কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায় যখন কবিতা লিখছেন তখন রবিকিরণের প্রভাবে তাঁদের কাব্যকৃতিকে শুধুই 'মহিলাকবি'র চেষ্টাকৃত রচনা হিসেবে অগ্রাহ্য করে চলে আজও বাঙালি সমাজ। কিন্তু সময়-সমাজ-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বর কীভাবে জড়িয়ে পড়ছে একজন নারীর সৃষ্টির ভিতরে সেই খোঁজের দিশা পাওয়া যায় এই দুজন কবির কাব্যের ভিতরে। আধিপত্যবাদের পায়ে সমর্পণ কখন 'না' বলতে শেখাচ্ছে শিক্ষিত নারীদের, তার আভাসও ফুটে উঠেছে তাঁদের কাব্যে। স্বরের ইতিহাস থাকে। সেই ইতিহাস যে বহন করতে জানে সে পারে স্বরের ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নারীদের কাব্যিক স্বরের গভীরে জমানো ছাইচাপা আগুন আস্ত এক স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পরবর্তী কবি কবিতা সিংহের কবিতায়। উচ্চকিত সেই স্বর যেন হিসেব বুঝে নিচ্ছে ঐতিহ্যবাহী অবহেলা যন্ত্রণার যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদের উপহার দিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। ষাটের কবি দেবারতি মিত্র কবিতা সিংহকে আত্মস্থ করে একান্ত যে নিজস্বতার জন্ম দিয়েছে কাব্য জুড়ে সেখানে নারী হয়ে উঠেছে নিয়ন্তা এবং পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। নারী তার নিজের মতো ব্যসনে সাজাচ্ছে পুরুষকে। দেবারতি মিত্রের কাব্যের ভিতর যাপিত সেই অভিজ্ঞ নারী স্বাধীনতার নামে বেছে নিচ্ছে একাকীত্বকে। একসময় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একাকীত্বের স্বরের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী একাকীত্বের স্বরের অদ্ভুত যোগাযোগ খুঁজে পাই আমরা।

অধ্যায়ের শুরুতেই যেহেতু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালপর্যায় নিয়ে আলোচনাটাই গবেষকের উদ্দেশ্য, তাই সরাসরি উনিশ শতকে প্রবেশের আগে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীত কক্ষে বসবাসকারী নারীজাতির যুগযুগ ধরে প্রবহমান পরাধীনতার ইতিহাসের যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে। প্রাচীন সমাজ থেকেই কীভাবে নারীকে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সরিয়ে এনে বেঁধে ফেলা হচ্ছে চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পথ ধরে মধ্যযুগ এবং প্রাগাধুনিক পর্যায়ে 'মহিলা কবি'দের উল্লেখসহ দ্রুত আলোকপাত করা হয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল হিসেবে আক্ষরিকভাবে গৃহীত উনিশ শতকের প্রতি। উনিশ শতক জুড়ে গতিশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি-মনোভাব-আধিপত্যবাদ কীভাবে গড়ে তুলছে নারীর জীবনকে, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তার ব্যক্তি ইচ্ছে এবং ব্যক্তি অস্তিত্বকে-সেইদিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটকাতর-তাড়না এবং উপার্জনহীন পরাধীনতা কীভাবে সমাজের আঙ্গিক গঠন করছে এবং নারীর বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় অধ্যায়ে সময়ের যাত্রাপ্রেক্ষিত এবং সমাজের নিষ্ঠুর আধিপত্যবাদের চোখরাঙানিকে অতিক্রম করে উঠে আসা বিভিন্ন শুভবোধমূলক আন্দোলনের উল্লেখসহ স্ত্রীশিক্ষাপ্রসার আন্দোলন কীভাবে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আনছে নারীলিঙ্গে চিহ্নিত বহু কবিদের এমন দৃষ্টান্ত সংযোগেই আলোকপাত করার ইচ্ছে রয়েছে কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায়ের কাব্যভাবনার প্রতি। তাঁদের কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁদের স্বর যেখানে সাংকেতিক সেখানেই বিদ্রোহের বার্তা লুকিয়ে রয়েছে। যে কথা সরাসরি সমাজে বলা নিষিদ্ধ ছিল, নারীর মুখ দিয়ে যে বিষণ্ণতা বা হাহাকারের কথা, উচ্চারণ সমাজ দ্বারা পরিচালিত সাহিত্যভূমি স্বীকার করে নিত না, সেইসব কথা এত বেড়া, এত আগলের ভিতর থেকেও কবিরা চাইছেন রচনা করতে, এমন অজস্র কবিতা তুলে আনা হয়েছে। কবি মানকুমারী বসুর গার্হস্থ্য ধর্মের ভিতরে যখন 'অরণ্যে রোদন', 'নিষ্ঠুর সংসার' এরকম বেশকিছু কবিতা সমর্পণী স্বরের ভিত থেকে হঠাৎ বিদ্রোহের আভাস দিয়ে যায়। তেমনই কবি কামিনী রায় বহু কবিতায় যেমন 'নারীর প্রতিবাদ',

‘নারীনিগ্রহ’, ‘নারীজাগরণ’-এর মধ্যে দিয়ে সরাসরি সমাজকে দংশন করেছেন, আবার পরোক্ষভাবেও অনেক কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বর ফুটে উঠেছে। এভাবেই অধ্যায় জুড়ে কবিতায় সমর্পণের স্বর যেমন দেখানো হয়েছে তেমনই কোনো কবিতায় বিদ্রোহের স্বর বেজে উঠেছে সেইদিকটাও দেখানোর ইচ্ছে রয়েছে আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

স্বাধীনতাপরবর্তী পর্যায় মানে কখনোই তার সূত্রপাত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ঘটছে এমনটা নয়। এই পর্বের জের টেনে চল্লিশ দশক অবশ্যই চলে আসে আলোচনায়। এইখান থেকেই তৃতীয় অধ্যায়ের পথ চলা শুরু। সেই সময়ের স্ত্রীশিক্ষা এবং নারী অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটিত বিভিন্ন আন্দোলনের উল্লেখ, স্বাধীনতা উত্তর সময়পর্যায়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি অন্তর্গঠনমূলক ক্ষেত্রে নারীদের চিন্তা-চেতনার পট পরিবর্তনের দিকে সমানভাবে আলোকপাত করা হবে। এই সময় পর্যায়কে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের কাব্যজগতের মূলস্বরের বিরোধিতা করে কীভাবে কবি কবিতা সিংহের নারীস্বর জেগে উঠেছে আমরা জানি। এক জ্বলন্ত রমণী যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত অত্যাচার, অবহেলা ঘৃণার সপাটে জবাব দিতে ইতিহাসকে ধারণ করে রেখেছেন মাথার ভিতরে, বুকের গভীরে। আর তারই প্রতিফলিত রূপ কবিতা সিংহের কবিতাগুলি, যেখানে প্রতিমুহূর্তে নারী মুখোশ টেনে খুলে ফেলছেন সমাজের। কবির ‘সহজসুন্দরী’, ‘কবিতা পরমেশ্বরী’, ‘হরিণাবৈরী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে সেই আত্মান্বেষণে মগ্ন এক কবির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অপরদিকে ষাটের দশকের কবি দেবারতি মিত্রের স্বর শান্ত, স্বল্পবাকভঙ্গিমায় সিদ্ধ এক কাব্যজগতের অধিকর্ত্রী তিনি। কিন্তু সেই জগতের ভিতর মুঠো মুঠো আগুন যেন শান্ত হয়ে বসে। ‘অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজে’, তুন্নুর কম্পিউটার’, ‘ভূতেরা ও খুকী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় এক অভিজ্ঞ ভারবাহী নারীকে। কবিতার মধ্যে দিয়ে এমন দুটি চোখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চান দেবারতি, যে চোখ তুমুলভাবে এক কালচেতনায় পারদর্শী নারীর চোখ। যে বুঝে ফেলেছে প্রতিটি পরতে ঠিক যতবার নারী উঠে আসার চেষ্টা করেছে, ঠিক ততবার মুখোশ বদলানোর প্রয়োজন পড়েছে সমাজের। হাতে মরীচিকা নিয়ে ডাকা সমাজে এখন নারী প্রলুব্ধ হতে হতে ক্রমেই

বিজ্ঞাপনের পোস্টার হয়ে যাচ্ছে। তাই কবির কাব্যভূমি একান্ত নিরালা জলের তলায় এক ঘর খুঁজে নিয়েছেন, যে জলের তলায় নারীকে নির্বাসন দেওয়া যায়। আসলে কবি বুঝে গেছেন, যে নারী স্বাধীন সে নারীকে ক্রমেই একা করে দেয় সমাজ। এমনই নতুন এক প্রতিবাদে মুখর দেবারতি মিত্রের কবিতা।

সর্বশেষ অধ্যায়ে নির্বাচিত চারজন কবির মধ্যে খুঁজে চলার চেষ্টা করা হবে স্বরের অমিল এবং মিল। কবি মানকুমারী বসু, কবি কামিনী রায়, কবি কবিতা সিংহ এবং কবি দেবারতি মিত্র এই চারজনের কবিতাকে পাশাপাশি রেখে ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা-স্বরগ্রামের ওঠানামার প্রতি নজর দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে এই অধ্যায় জুড়ে। নির্বাচিত চারজন কবির দুই কালের পর্যায়ভেদে মিল-অমিল-বিনয়-নতজানু-গর্জন প্রতিটি স্তরে যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া হবে একটি আরশির খোঁজে। এমন একটি আরশি যেখানে সমাজের পুরুষ নারী নির্বিশেষে জরিপ করে নিচ্ছে নিজেদের। বর্তমান সমাজ বিশ্বে দাঁড়িয়ে আলোচিত বিষয়ে ভূমিগত দৃঢ়তা বা অবস্থান এখন ঠিক কি, সেইদিকেই এগোবে গবেষণা। কবিতার মধ্যে দিয়ে যে ভাব, দর্শন ও অনুভবের সারাৎসার আজ রচিত হচ্ছে সেখানে আলোচিত ক্ষেত্রভূমির অবস্থান ও প্রভাব রয়েছে ঠিক কতখানি? সমাজ জুড়ে এই যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়তি মেদটুকু লুকিয়ে রেখে যে আত্মদর্শন তার মধ্যে কতখানি সত্যবোধ রয়েছে যেন তারই অভিমুখ রচনায় এই চারজন কবিকে ঘিরে এই অধ্যায় আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবি মানকুমারী বসুর কবিতায় যে স্বর ছিল সাংকেতিক, সেই স্বর কীভাবে দেবারতি মিত্রের কবিতায় এসে নিজস্ব স্বরগ্রামে স্পষ্ট উচ্চারণ তৈরি করে ফেলছে সেইদিক যেমন দেখানো দরকার, তেমনই যে স্বাধীনতা এসে গেছে বলে আনন্দিত ছিলেন কবি কামিনী রায় সেই বহু প্রতীক্ষিত নারীদের স্বাধীনতার যোগ্য স্বর কীভাবে কবি কবিতা সিংহ ফুটিয়ে তুলছেন তাঁর কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে সেটাও দেখানোর ইচ্ছে এই অধ্যায়ে। তবে সর্বশেষে বিভেদ নয়, স্তরান্তর রচিত করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আমি পড়তে গিয়ে দেখেছি স্বরালাপের ভিতর দিয়ে উঠে এসেছে নারীদের কাব্যজগতে উত্থান-পতনের গ্রাফ। উঠে এসেছে একটিই স্বর, যে স্বরকে এগিয়ে

নিয়ে চলার চেষ্টা করছে প্রতিজনে। মিলিত এই স্বরের শেষ পরিণতির একটি কাব্যিক ছায়াচিত্র বহন করছেন শেষ নির্বাচিত কবি দেবারতি। যিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন এই লড়াই ফুরবার নয়। নারীর কাছে তাই স্বাধীনতার শর্তে পড়ে থাকছে শূন্য আর একাকীত্বের পাঠ।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ও সমাজকে ব্যাখ্যা করার দ্বারাই সেই দুই কালপর্যায়ের কাব্যজগতে আয়োজিত আবহাওয়ার সাথে আমরা পরিচিত হতে পেরেছি। কীভাবে মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নারীদের কবিতা তার কারণও সেই সমসাময়িক মনোভাব যা বাংলা সাহিত্যের কাব্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাহিত হচ্ছিলো। পুরুষের চোখে নারীদের চিত্রায়ন কাব্যজগতে এক ঐতিহ্যনির্ভর পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল স্বাধীনতার আগে যেমন, তেমনই স্বাধীনতার পরেও। এই প্রচলিত ঘেরাটোপের ভিতর দাঁড়িয়ে নারীদের দ্বারা কোনো নতুন স্বরের জন্ম হচ্ছিলো কিনা তারই প্রমাণ বহন করে নির্বাচিত চারজন কবি। কবি মানকুমারী বসু এবং কবি কামিনী রায় যেমন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাব্যস্বরের চিহ্ন বহন করেছেন, যার কোথাও সমর্পণ, কোথাও সমর্পণ পেরিয়ে প্রতিবাদের ধ্বনি, তেমনই স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে কবি কবিতা সিংহ এবং কবি দেবারতি মিত্র জন্ম দিয়েছে এক নতুন স্বরের। সেই নতুন স্বরে উঠে এসেছে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নারীর চোখে গড়ে তোলা ‘স্বাধীনতা’ নামক শব্দের নতুন এক ব্যাখ্যা। গবেষণাপত্রের চারটি অধ্যায় জুড়ে গড়ে ওঠা আলোচনার সারাৎসারই স্থান পাবে উপসংহার অংশে।